OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 164 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 164 - 173
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ : প্রান্তজনের আধুনিক মহাকাব্য

বিমল দ্বারী
প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: bimaldwari2020@gmail.com
0009-0009-5666-2701

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Tatmatuli, Dhangartuli, Upper Class, Subaltern, Education, Superstition, Religion, Untouchable, Politics, Gandhi Baba, Ramayana.

Abstract

Satyanath Bhaduri’s Dhorai Charit Manas has been analyzed as an epic representation of the life struggle of marginalized people. Written in the socio-political context of the third and fourth decades of the twentieth century, the novel portrays the harsh realities of poverty, illiteracy, superstition, and social deprivation faced by the lower classes. The character of Dhorai is not merely an individual; rather, he represents the entire marginalized community, reflecting a journey marked by struggle, resistance, and the gradual development of self-awareness. The essay demonstrates that the exploitation of marginalized people is not confined to the upper classes alone; divisions, inequalities, and power conflicts are also active within their own communities. At the same time, religious beliefs, folk culture, and political ideologies—especially Gandhism—do reach these communities, but often in distorted and simplified forms. As a result, a tension emerges between lived reality and ideological ideals.

Through Dhorai’s experiences and struggles, the novel gradually reveals the awakening of self-consciousness and a sense of rights among marginalized people, although they repeatedly face deception and failure. Dhorai Charit Manas is not merely a novel; it is a powerful document of the history, struggle, and existence of marginalized people, where ordinary individuals emerge as the true heroes of history.

Discussion

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘অপমানিত’ কবিতায় সমাজের প্রান্তিক মানুষের অবস্থার উদ্দেশ্যে বলেছেন –

“মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।”[১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 164 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রান্তিক বা অন্ত্যজশ্রেণির মানুষের সাথে সমাজের সভ্য মানুষের সম্পর্ক ছিল বঞ্চনা, উপেক্ষা ও শোষণের। সাহিত্য সমাজের দর্পণ তাই আদি-মধ্য ও অন্ত্য সব যুগের সাহিত্যের মধ্যেই অন্ত্যজশ্রেণির অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, সমাজের নিয়ম-কানুন ও ধর্ম ফুটে উঠেছে। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নির্দশন হল 'চর্যাপদ', সেখানেও নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ মানুষের পরিচয় সুস্পষ্ট। চর্যাগীতিতে ডোম, চণ্ডাল, শবর প্রভৃতি অন্ত্যজ ও প্রান্তিক মানুষের জীবন প্রতীকি ও রূপকের মাধ্যমে উঠে এসেছে। চর্যাগীতিকারদের নামেও এই প্রভাব বর্তমান ছিল। মধ্যযুগের সমাজ ছিল সমস্যায় আচ্ছন্ন। সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের অবিরাম টানাপোড়েনে তার গতিপথ ছিল জটিল। সেই জটিল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও প্রান্তিক মানুষের উপস্থাপন ঘটেছে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের জীবন সংগ্রাম ও সামাজিক বঞ্চনা পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে ভক্তির মাধ্যমে জাতিভেদ ভাঙ্গার চেষ্টা করা হয়েছে। সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যে প্রান্তিক মানুষ বৈষম্য ও দারিদ্র্যের শিকার হলেও বাংলা লোকসাহিত্য মঙ্গলকাব্য ও চর্যাপদে তাদেরই জীবনই হয়ে উঠেছে মূল উপজীব্য বিষয়।

প্রান্তিক মানুষের বঞ্চনার কথা উঠে এসেছে মহাভারতের একলব্য, কর্ণের মতো চরিত্রের মধ্য দিয়েও। একলব্য ছিলেন নিষাদ বংশের প্রতিভাবান যুবক কিন্তু জন্মগত পরিচয়ের কারণে, দ্রোনাচার্য তাকে শিক্ষা দিতে অস্বীকার করেন। অপরদিকে, কর্ণ সূতপুত্র পরিচয়ের কারণে বারবার অপমানিত হন এবং তার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সমাজ তাকে পূর্ণ মর্যাদা দেয় না। রামায়ণ, মহাভারত, চর্যাপদ এবং মধ্যযুগের পরবর্তী আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও প্রান্তিক ও অন্ত্যজ মানুষের বিড়ম্বনার রূপ ফুটে উঠেছে।

আধুনিককালের মননশীল লেখক যাঁরা অন্ত্যজ মানুষের বাস্তবচিত্রকে তুলে ধরেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সতীনাথ ভাদুড়ী। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' তাঁর তৃতীয় উপন্যাস। ঢোঁড়াইয়ের আগে তিনি লিখেছেন 'জাগরী' ও 'চিত্র গুপ্তের ফাইল'। তিনি 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে তিরিশ-চল্লিশ দশকের রাজনীতি কীভাবে প্রান্তিক মানুষের সমাজ ও ব্যক্তিজীবন প্রভাবিত করেছিল তার চালচিত্র অঙ্কণ করেছেন। উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া শহরেই সতীনাথের জন্ম ও বড়ো হয়ে ওঠা। কলকাতার আলো ঝলমল কর্মচঞ্চল আবহাওয়া সতীনাথকে কখনই মোহিত করতে পারেনি। তাই কলকাতায় গেছেন বহুবার কিন্তু বারবার ফিরে এসেছেন বনজঙ্গল ঝোপঝাড় আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাঁচা-পাকা বাড়ির আঙিনায় অবস্থানকারী অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের কাছে। এ প্রসঙ্গে সতীনাথ বাবু সম্পর্কে বিমল কর বলেছেন—

> "সংস্কৃতির পীঠস্থানে প্রণামী ফেলতে আসার লোক তিনি নন।"[২]

তাঁর এই মাটির দিকে চোখ রেখে চলার মনোভাবের জন্যই তিনি অন্ত্যজ মানুষের আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন। তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'-এর আদলে সৃষ্ট অন্ত্যজ শ্রেণির নায়ক ঢোঁড়াইয়ের জীবনের উত্থান-পতন অনুসারে রচিত 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। রামায়ণের সাত কাণ্ডের মতো 'আদি', 'বাল্য', 'পঞ্চায়েত', 'রামিয়া', 'সাগিয়া' 'লঙ্কা' ও 'হতাশা' কাণ্ডে রচিত, এই উপন্যাস মহাকাব্যিক রসাস্বাদনে সক্ষম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সতীনাথ তার 'ঢোঁড়াই' প্রবন্ধে বলেছেন–

> "এই ঢোঁড়াইকে এযুগের শ্রী রামচন্দ্র করবার কঠিন কাজ ছিল আমার সম্মুখে। শ্রী রামচন্দ্রের চেয়ে ছোট আদর্শে উত্তর ভারতের সাধারণ লোকের মন ভরে না। ... ইচ্ছা ছিল আমার জ্ঞানে গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমন ভাবে বদলাতে দেখেছি, কেমন ভাবে তারা ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে মানুষ হিসাবে নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে তাই নিয়ে একখান উপন্যাস লিখব।"[৩]

লেখকের এই কথাটিই 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' সৃষ্টির মূল কারণ। যেকোনো লেখকের লেখাতেই একটি শিক্ষা বা জীবন বোধ থাকে। ভারতবর্ষের তিরিশ-চল্লিশের দশক মূলত ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তী ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক কাল। প্রথম জীবনে সতীনাথ রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত ছিলেন, পরবর্তীতে সতীনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তিনি রাজনীতি পরিত্যাগ করলেও রাজনৈতিক মনোভাব তাঁর মধ্যে রয়ে যায়। ফলে তাঁর সাহিত্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনীতির প্রভাব পড়েছে। এই উপন্যাসেও ঢোঁড়াই রাজনীতির আদর্শে প্রান্তিক মানুষ ও তার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 164 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পরিচিত সমাজকে বদলেছে। সমগ্র উপন্যাসে রয়েছে প্রধানত তিনটি বিষয় 'রামচরিত মানস', রাজনীতি এবং অন্ত্যজ শ্রেণির নায়ক ঢোঁড়াইয়ের জীবন বৃত্তান্ত।

সমাজের কাঠামো কখনই সমতাভিত্তিক নয়; বরং তা শ্রেণি, জাত, অর্থনৈতিক অবস্থান ও ক্ষমতার ভিত্তিতে বিভক্ত। এই বিভাজনের ফলে সমাজের এক বৃহৎ অংশ দীর্ঘদিন ধরে মূলধারার বাইরে থেকে যায়। এদেরই বলা হয় অন্ত্যজ বা প্রান্তিক মানুষ। 'অন্ত্যজ' বা 'প্রান্তিক' শব্দের অর্থ সমাজের শেষ প্রান্তে অবস্থানকারী যারা সবদিক থেকেই বঞ্চিত, উপেক্ষিত এবং শোষিত। অন্ত্যজ সমাজের সাধারণ মানুষের পরিচয় হল তাদের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থান, অশিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে সৃষ্ট ধর্ম, কুসংস্কার ও সামাজিক রীতিনীতি, তাছাড়াও ভাষা, লোককথা যা শহরের শিক্ষিত সভ্য সমাজের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের প্রথমেই বিহারের পূর্ণিয়া জেলার জিরানিয়া বা জীর্ণারণ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্য দিয়ে অন্ত্যজ শ্রেণির বর্ণনা দিয়েছেন–

"জঙ্গল আ গেয়া, জিরানিয়া আ গেয়া, (জঙ্গল এসে গিয়েছে, জিরানিয়া এসে গিয়েছে)।"[৪]

দুই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ বসবাস করে জঙ্গলাকীর্ণ শহর থেকেও চার মাইল অদূরে অবস্থিত তাৎমাটুলি ও ধাঙড়টুলিতে। এই দুই টুলির মাঝে অবস্থান করে 'পাক্কী' অথবা কোশী শিলিগুড়ি রোড, যা উভয় সমাজের বিচ্ছেদরেখা। এই দুই অস্পৃশ্য দলের অন্তরেও রয়েছে স্পৃশ্য অস্পৃশ্যতর বিভাগ।

তাৎমা অন্ত্যজ সমাজের রীতিনীতির পরিচয় পাই ঢোঁড়াইয়ের মা বুধনীর 'ডিস্টিবোর্ডের ভাইচেরমেন' বাবুলাল চাপরাসীকে পুনঃবিবাহ করার মধ্য দিয়ে যা অন্ত্যজ শ্রেণির এক অবদমিত সত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উচ্চবর্গীয় সমাজে যে ধরনের নিয়ম, শালীনতা বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকে, অন্ত্যজ সমাজে তা অনেকটাই অনুপস্থিত। সমাজ সেই জন্যই বুধনিকে বলেছে –

"মেয়ে মানুষ আবার বিধবা থাকবে কি!"[৫]

অন্যদিকে বুধনী চরম দারিদ্রকে পাশ কাটিয়ে জীবিকা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি, তার মনে লুকিয়ে থাকা শারিরীক ক্ষুধার চরম পরিণতি লাভ করে। মাতৃত্বের কর্তব্য তাকে বিচলিত করতে পারিনি, তাই দু'বছরের ঢোঁড়াইকে সে বৌকাবাওয়ার কাছে নামিয়ে চলে আসে—

"একদিন সকালবেলায় গোঁসাইথানে বৌকাবাওয়ার পায়ের কাছে ছেলেটাকে ধপ্ করে নামায়"[৬]

অন্যদিকে তাৎমাদের আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হলে সন্ধ্যের পর পাড়ায় 'বাবুভাইড়া' ও বাজারের লোকেদের আনাগোনা বেড়ে যায়। ধানকাটনী রাজ্যে তাৎমা মেয়েরা ভর্সড়ের বাবুদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। সেই হেতু অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের মনোভাব -

"যে মেয়ের যৌবন আছে তার রোজগারের অভাব নেই।"[৭]

একই রকম ভাবে ধাঙড়টুলিতে গড়ে উঠেছে সাহেবের বাড়িতে কর্মরত সামুয়র ও শনিচরার বউয়ের সম্পর্ক। প্রান্তিক শ্রেণির এই যৌনতৃপ্তি কোন রোমান্টিক বিষয় নয়, বরং দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি। বিপরীতভাবে, বিসকান্ধায় কোয়েরীটোলার গিরিধরের সাথে কানী মুসহরনীর সম্পর্ককে দেখানো হয়েছে শুধুমাত্র শারীরিক ভোগের বস্তু হিসেবে। অন্ত্যজ মানুষের জীবনে যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষার সুযোগ ও নৈতিকতার প্রচলিত কাঠামো দুর্বল, সেখানে যৌন সম্পর্ক অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত নয়, বরং স্বতঃস্ফূর্ত ও পরিস্থিতিনির্ভর। লেখক শুধুমাত্র প্রান্তিক মানুষের যৌন শিথিলতাকেই উল্লেখ করেননি, ঢোঁড়াইয়ের সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশের মধ্যে স্ত্রী রামিয়া ও হৃদয়ের কাছের মানুষ সাগিয়ার জৈব কামনাহীন প্রেমের ছোট ছোট আবেগময় সুন্দর মুহূর্তের উপস্থাপন ঘটিয়ে বিশুদ্ধ রোমান্টিক প্রেমেরও নির্মাণ করেছেন।

অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ তাৎমা-ধাঙড়দের কুসংস্কারের মূল উৎস অশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা। অজ্ঞতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সামাজিক অবহেলা ও বঞ্চনার কারণে তারা প্রাকৃতিক ঘটনা, রোগব্যাধি বা দৈনন্দিন সমস্যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না পেয়ে অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর করে। উপন্যাসে অজস্র প্রথা-সংস্কার, নিয়ম-নীতি, এবং সহজাত বিশ্বাস অন্ত্যজ তাৎমা-ধাঙড় সম্প্রদায়ের মানুষগুলিকে আবিষ্ট করে রেখেছে। ঢোঁড়াইয়ের বাপ মারা যায় পেয়ারা খেয়ে কারণ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 164 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তাৎমাদের অন্ধ কুসংস্কার অনুযায়ী বর্ষার আগে পেয়ারা খেলে জ্বর হয়, আর আশ্বিনের পর জ্বর হয় বাতাবি লেবু খেলে। ঢোঁড়াইয়ের শরীর খারাপ হলে বুধনী শহরের হাসপাতাল, বাঙালি ডাক্তারের প্রমাণ নির্ভর বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাশাস্ত্র অপেক্ষা রেবণগুণীর মন্ত্রের উপর বেশি বিশ্বাস করে। সেই জন্যই বুধনী বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপর প্রশ্ন তুলেছেন—

> "টৌনের হাসপাতালে গেলে কোন লোক আর বাড়ি ফিরেই আসে না। কপিল রাজা তো বাংগালী 'ড'ক্টর' দিয়েও দেখিয়েছিল।"[৮]

অন্যদিকে ফুলঝরিয়ার খোঁড়া পা ঠিক হয়ে যাবার প্রসঙ্গে রেবণগুণীর উক্তি–

> "জন্মানোর ছ'দিনের মধ্যে কাঁকড়াবিছে ভাজা সরষের তেল ঐ পায়ে মালিশ করতে পারলে; তবে ঐ বিড়ালের হাড়ের দোষ কাটাতে পারত।"[৯]

ঢোঁড়াই ঝাঁড়ফুক, তাবিজ-কবচে আস্থা রেখে রেবণগুণীর কাছে ছুটে গেছে পশ্চিমী মেয়ে রামিয়াকে বশ করার জন্য।

শনিচরার বাঁশঝাড়ে ফুল ধরাকে কেন্দ্র করে ধাঙড়টুলিতে অমঙ্গল ও আশঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে আসে। ধাঙড়দের দেবতা 'বাঙ্গাবাঙ্গী'-র নির্দেশ বাঁশগাছে ফুল আসা মানেই অকাল ও দুঃসময় আবির্ভাব ঘটতে চলেছে অর্থাৎ বারো বছরের মধ্যে সেই স্থান ছেড়ে চলে যেতে হবে ধাঙড়দের। ফলস্বরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রান্তিক ধাঙড় সমাজ স্থায়ী বাসস্থান থেকে শনিচরাকে ঠেলে দেয় এক অজানা ভবিষ্যতের পথে। লৌকিক বিশ্বাসবোধের উপর এরা মনে করে নদীর পানি খেলে গলগণ্ড হয়, জলে ডুবে মারা গেলে হয় 'পানিভূত' এবং সঠিকভাবে কোন মেয়েমানুষের শ্রাদ্ধ-শান্তি না হলে হয় 'শাঁখড়েল-পেত্নী'। তাৎমা সম্প্রদায়ের প্রচলিত বিবাহ নিয়ম-নীতি অনুযায়ী বিজোড় সংখ্যায় চাল দান অশুভ ও বিবাহ বিচ্ছেদের পরিচয়। ঢোঁড়াই আর রামিয়ার বিয়ের সময় ঢোঁড়াই চালের দান দিয়েছিল নয়টি কিন্তু মিশিরজী চেঁচিয়ে জোড় সংখ্যা দশ বললেও ঢোঁড়াই সংকটের দিনে স্থির করে নেয় তার বিজোড় দান চালানোর জন্যই রামিয়াকে হারাতে হয়। তাৎমা ঝোটাহারা ঘন ঘন স্নান ও কাপড় পরিস্কার করলে তাৎমা ছেলে, বুড়ো ও অন্যমেয়েরা তাকে 'নট্টীন' বলে বিদ্রুপ করে। সমান্তরাল ভাবে উপন্যাসের শেষের দিকে দেখতে পাই বিসকান্ধার রাজপুতটোলায় গ্রামীণ প্রথার উপর নির্ভর করে বাবুসাহেব সুযোগ সন্ধানী গিরিধরের মাধ্যমে মোসম্মতকে 'ডাইনি' রূপে আবিষ্কার করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করেছেন। এই অলৌকিক বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল হয়ে একদিকে শোষকশ্রেণি লাভবান হয়েছে অন্যদিকে প্রান্তিক মানুষেরা আরও গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছেন। কুসংস্কার দূর করতে হলে শিক্ষা, সচেতনতা এবং সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া অপরিহার্য।

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণত দেখা যায় উচ্চবর্ণ বনাম নিম্নবর্ণ বা স্পৃশ্য বনাম অস্পৃশ্য বিভাজন। কিন্তু এই উপন্যাসে লেখক এক নতুন ভাবধারার জন্ম দিয়েছেন। যাদের সমাজ 'অস্পৃশ্য' বলে চিহ্নিত করেছে, তাদের মধ্যেও আবার সূক্ষ্ম স্তরে বিভাজন, শ্রেণীবিভাগ ও পারস্পরিক ঘৃণা কাজ করে। অর্থাৎ, প্রান্তিকতার মধ্যেও আর এক প্রান্তিকতা তৈরি হয়। তাৎমারা ধাঙড়দের ছোট চোখে দেখে, তাদের 'বুড়বক কিরিস্তান'(বোকা খৃস্টান) বলে উপহাস করে। ধাঙড়রা কোন কাজের বাছবিচার করে না। তাদের কাছে রোজগারটাই আসল। সেইকারণে তাৎমারা অভিমান ও আপশোসের সুরে বলেছে–

> "রাতদিন পচই খেয়েও দুবেলা ভাত ডালের উপর আবার তরকারি খায়; আর আমাদের বরাতে মকাই মারুয়ার দানাও জোটে না।"[১০]

শুধুমাত্র তাই নয় নিজের জাতের মানুষ বাবুলাল চাপরাসী শহরের অফিসে নিজের জীবন পরিবর্তন ঘটিয়েছে সেই জন্য তাকে তারা সম্ভ্রম ও স্বতন্ত্র চোখে দেখে, নিজেদের জাতিকে গৌরবান্বিত মনে করে। কিন্তু একইভাবে ধাঙড়রা যখন শহরের খ্রিস্টানদের বাড়িতে কাজ করে অর্থ উপার্জন করে, তখন তাৎমাদের উক্তি ধাঙড়রা নিজেদের জাত ধর্ম নষ্ট করেছে। তাৎমাদের দারিদ্র ও ধাঙড়দের আর্থিক স্বচ্ছলতার এই চিত্রের মধ্যে লেখক দেখিয়েছেন পেশাগত অহংবোধ ও সামাজিক পরিচয়। এমনকি তাৎমাদের নিজেদের মধ্যেও রয়েছে বর্ণবৈষম্য। যেমন মুখেরিয়া তাৎমা ও কনৌজি তাৎমা, আবার কিছু তাৎমাদের মধ্যে পৈতা গ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ হওয়ার আকাঙ্খা রয়েছে। বিসকান্ধার কোয়েরিটোলায় ঢোঁড়াইয়ের আবির্ভাবের মুহূর্তে তার নিজস্ব জাতের উপর তীব্র ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও তন্ত্রিমাছত্রি জাতটাকে কুশবাহাছত্রি জাতের থেকে নীচু

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 164 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বলে তুলনা করলে, ঢোঁড়াই নিশ্চুপ থাকতে পারেনি, কল্কে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে অপমানের প্রতিবাদ জানায়। মুখেরিয়া তাৎমারা রাজমিস্ত্রির কাজ করে, তাদের মেয়েরা মইয়ে চড়ে বলে হীন চোখে দেখা হয়েছে। এই বিভাজন প্রধানত পেশা ও সামাজিক মর্যাদার উপর নির্ভরশীল। যারা মাটি কাটার কাজ করে তাদেরকে তাৎমারা সবথেকে অস্পৃশ্যতর রূপে বিবেচনা করে। ঢোঁড়াই মাটি কাটার কাজ করতে চাইলে, ধাঙড়রা তার জাতের পরিচয়ের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছে—

> "নোখে বেলদার কবে পচ্ছিম থেকে এসে এক কোটি বছরের উপর এই এলাকায় আছে। তাকে কি তোর জাতভাইয়া মানুষ বলে ভাবে? সে বেচারা রোজ কাজ করার সময় এই নিয়ে দুঃখু করে।"[১১]

এই অভ্যন্তরীণ বিভাজন প্রান্তিক সমাজকে আরও দুর্বল করে তোলে। এই চিত্রটি আসলে বৃহত্তর ভারতীয় বর্ণব্যবস্থারই প্রতিফলন। অর্থাৎ, যারা বঞ্চনার শিকার, তারাই আবার অন্যকে বঞ্চিত করার মানসিকতা লালন করে। এতে বোঝা যায়, শোষণ শুধু ওপর থেকে নিচে নেমে আসে না, নিচের স্তরেও ক্ষমতা ও আধিপত্যের ক্ষুদ্র কাঠামো তৈরি হয় এবং সেই কাঠামোই আবার নতুন করে বৈষম্য সৃষ্টি করে। এই ধারণাটি অনেকটা 'Subaltern Studies'-এর আলোচনার সঙ্গে মিলে যায়, যেখানে বলা হয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী একক ও অভিন্ন নয়; তাদের মধ্যেও ভাঙন, দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার রাজনীতি আছে। ফলে অস্পৃশ্যের মধ্যেও অস্পৃশ্য— এই ধারণা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, সামাজিক বৈষম্য শুধু বর্ণব্যবস্থার ফল নয়, বরং মানুষের মানসিকতা, সংস্কার ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত।

তাৎমাদের অশিক্ষা ও সচেতনতার অভাব এক কঠিন বাস্তবতার ইঙ্গিত বহন করেছে। প্রান্তিক সমাজের শিশুরা খুব অল্প বয়স থেকেই প্রাপ্তবয়স্কদের জগতে ঢুকে পড়ে কাজ, অভ্যাস এমনকি নেশার দিকেও। মা ছেলেকে সবসময় নেশা, মাদকতা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে কিন্তু তাৎমাদের সমাজে ছেলেমেয়ে, বুড়ো সকলে একসঙ্গে তামাক পান করে। বুধনী মা হয়ে ছেলেকে নিজে বিড়ি ধরিয়ে দিয়েছে, অন্ত্যজ শ্রেণির সেই সচেতনতার অভাবের কঠিন বাস্তব চিত্র প্রকাশ পেয়েছে বুধনির এই উক্তির মাধ্যমে –

> "সেকরার দোকানের সিঁড়ির উপর বুধনী ওকে একটা বিড়িও ধরিয়ে দিয়েছিল। ও ছোঁড়া তখনও কাশে।"[১২]

এই অশিক্ষা ও অজ্ঞতার আরও একটি রূপ ফুটে উঠেছে ধর্মের আদলে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাৎমাদের জীবনে ধর্ম অনেকসময় তাদের বেঁচে থাকার আশা, সংগ্রামের শক্তি এবং সমষ্টিগত পরিচয়ের আদর্শ। তাদের সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের নিচে অবস্থিত সিঁদুর মাখানো উঁচু মাটির ঢিবি যা 'গোঁসাই' (তাৎমারা সূর্যদেবকেও 'গোঁসাই' নামে সম্বোধন করে) নামে পরিচিত। এই গ্রামীণদেবতা বা আঞ্চলিক বিশ্বাসের মধ্যে তারা নিজেদের অস্তিত্ব ও সংস্কৃতির প্রকাশ খুঁজে পেয়েছে। 'গোঁসাই' ও 'রামায়ণ' এই দুটো জিনিসই তাদের মূল জীবনের ভিত্তি। তাৎমারা নিরক্ষর হলেও তাদের সুখ-দুঃখ, ভালো-খারাপ, উন্নতি-অবনতি সব রকম অবস্থাতেই একমাত্র সহায় 'রামচরিত মানস'। তারা রামকেই নিজস্ব বিশ্বাস বোধের উপর গড়ে তুলেছেন আদর্শ পুরুষ রূপে। সেইরূপ ধর্মের আলোকে গান্ধিজি হয়ে উঠেছেন 'গানহীবাবা' বা 'মহাত্মাজি' প্রায় এক দেবতুল্য চরিত্র। তাৎমা-ধাঙড়দের মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে গান্ধিজি কোনো জটিল রাজনৈতিক মতবাদের বাহক নন; তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ, অহিংসা, সত্যাগ্রহ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ - এই উপন্যাসে বিকৃত বা সরলীকৃত রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। অন্ত্যজ মানুষ সেই আদর্শের গভীরতা বুঝতে না পারলেও, তারা তার একটি আবেগঘন ও সহজবোধ্য রূপ গ্রহণ করেছে। ফলে গান্ধিজি এখানে রাজনৈতিক নেতা থেকে ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক প্রতীকে রূপান্তরিত। শিক্ষার অভাব, সামাজিক বঞ্চনা ও বাস্তব জীবনের দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে তারা গান্ধিজির নাম ও ভাবমূর্তিকে নিজেদের মতো করে গড়ে নিয়েছে। ফলে এই 'গানহীবাবা' ধারণা হয়ে উঠেছে অন্ত্যজ মানুষের মানসিক আশ্রয়। সমাজে যেখানে তারা অবহেলিত, শোষিত ও অস্পৃশ্য, সেখানে গান্ধি বাবার প্রতি বিশ্বাস তাদের মনে আশার সঞ্চার করে। ফলে তাঁর ভাবমূর্তি লোককথা, গুজব ও কুসংস্কারের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে এক রহস্যময় চরিত্রে রূপ নেয়। উপন্যাসে দেখা যায়, গান্ধিজিকে ঘিরে নানা অলৌকিক গল্প, বিশ্বাস, এমনকি ধর্মীয় আচার তৈরি হয়। রবিয়ার বাড়ির চালে বিলিতি কুমড়োয় 'গানহীবাবা'-র আবির্ভাব ঘটে। বালক ঢোঁড়াইের একমাত্র অধিকার মূর্তি স্পর্শ করার কারণ সে বৌকাবাওয়া ভক্ত। ঠাকুরবাড়িতে রামসীতার মূর্তির পাশে 'গানহীবাওয়া'-র মূর্তি রাখা ঠিক নয় কারণ রামসীতা তাদের জীবন পথের প্রথম

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 164 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দিশারী ভগবান। বিশ্বাস ও সত্যের প্রতীক গান্ধিজি ভক্তের দুয়ারে এলেও, তাদের অভাবের সংসার সেই ঈশ্বরকে উপযুক্ত স্থান দিতে পারে না। দারিদ্র্য, দু:খ-কষ্ট, আর্থিক অনটনে জর্জরিত মানুষগুলি প্রথম অনুভব করেন তাদের সামাজিক অবস্থান, অসহায়তা, রুগ্নতা। তাই তুলসীদাস বলেছেন –

"নহি দরিদ্র সম দুখ জগমাঁহ"[১৩]

অন্যদিকে রেবনগুণী বিলিতি কুমড়োই গান্ধীমূর্তি দেখিয়ে অনেক দিনের মদের খরচ জোগাড় করে। 'গানহীবাওয়া' কে কেন্দ্র করে মহতো ও ছড়িদার 'ভকত' হয়ে সমাজে সম্মান, খাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করে। তাৎমা সমাজের চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে, তারা মনে করে গান্ধিজি উঁচুদরের সন্ন্যাসী। তাই তিনি মুসলমানকেও পিঁয়াজ গোস্ত খাওয়া ছাড়িয়েছে। তারাও প্রতিজ্ঞা করে মদ খাবে না, ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখবে, তাৎমা মেয়েরাও মাসে একবার স্নান করবে। গণেশপুরের বেলগাছের পাতায় গান্ধিজির নাম লেখা আছে দেখে বৌকাবাওয়া বেল গাছের ডালে হুঁকো বেঁধে সংযম পালন করে। মহতোরা পঞ্চায়েতে নির্দেশ দেয় রবিবারে 'গানহীবাওয়া'-র নামে কাজে যাবে না কারণ রবিবার উৎসবের দিন। কিন্তু বালক ঢোঁড়াইয়ের 'গানহীবাওয়া'-র প্রতি আনুগত্য থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এতে তাদের অন্ন সংস্থানের পথ সংকীর্ণ হয়ে গেল। তাই ঢোঁড়ায় পঞ্চায়েতে প্রথম প্রতিবাদ করে –

"আমাদের 'পেট কেটো' না মহতো।"[১৪]

কারণ রবিবার বাবুভাইয়ারা ঘরে থাকে। ভিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হয় সেইদিন। এতে বোঝা যায়, কীভাবে জাতীয় রাজনীতি গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির মধ্যে ভিন্নভাবে প্রবেশ করে। তাদের চিরাচরিত অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে গান্ধিজির এই সমস্ত ঘটনাগুলি পরোক্ষভাবে সমগ্র সমাজচিত্রকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। প্রথমদিকে আবেগ ও উত্তেজনায় ধর্মীয় ব্যাখ্যায় নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে এই 'গানহীবাওয়া' হয়ে উঠেছে 'মহাৎমাজী' ফলে তাদের পুরনো যুক্তিগুলি তাদের নিজেদের কাছেই অসাড় প্রতিপন্ন রূপে বিবেচিত হয়। সময় বদলেছে সময়ের সাথে সাথে মানুষও পরিবর্তনশীল, এই বদল খুব দ্রুত যা সহজে মানুষের চোখে পড়ে না। তাই মহতো বলেছে –

> "কিছুদিন থেকে দুনিয়া দরকারের চাইতেও বেশি তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। ঘটনার পর ঘটনার আঘাত লাগছে তাৎমাটুলির সমাজে, তাৎমাদের মনে।"[১৫]

তাৎমাটুলির নায়ক ঢোঁড়াইয়ের জীবনধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তার সমাজ ও সমাজের মানুষজন। গাড়ির গাড়োয়ান হয়ে বাইরের জগতের বিচিত্র খবরের সঙ্গে পরিচিত হওয়াই নিজেকে তাৎমাটুলির জীবনধারার মধ্যে আবদ্ধ রাখেনি। সে পরিবর্তন করেছে নিজেকে ও সমাজকে। সতীনাথ ভাদুড়ী এখানে দেখাতে চেয়েছেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতা গান্ধিজি প্রান্তিক সমাজে পৌঁছালেও তাঁর প্রকৃত আদর্শ নয়, বরং এক বিকৃত ও লোকায়ত রূপই বেশি প্রভাব ফেলেছিল।

উপন্যাসের তাৎমা ও ধাঙড় শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষার অভাব প্রকট। দারিদ্র্য, বর্ণবৈষম্য এবং সামাজিক বঞ্চনার কারণে তারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। লেখক আগাগোড়া সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের সরাসরি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পথ সঙ্কীর্ণ করে রেখেছেন, তিনি চেয়েছেন ঢোঁড়াই ও তার সমাজের মানুষ সামাজিক অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক চেতনা এবং জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজের অধিকার বুঝে নেবে। কারণ বিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে লেখক দেখেছেন প্রথাগত শিক্ষার তুলনায় বাস্তব ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক নেতা, স্বার্থান্বেষী মানুষ শুধুমাত্র নিজের আখেরটি গুছিয়ে নিয়েছে এ যেন সমগ্র ভারতবর্ষের এক জ্বলন্ত বাস্তব দৃষ্টান্ত। লেখক মাত্র দুটি উদাহরণের মাধ্যমে উচ্চবর্ণের ও প্রান্তিক মানুষের শিক্ষার বাস্তবচিত্রটি তুলে ধরেছেন। আর্থিক সামর্থ্য থাকায় লাডলীবাবু তার গৃহিণী ও পুত্রদেরকে নিয়ে সদরে চলে যেতে চেয়েছেন কারণ গ্রামে থাকলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হবে না। সেই হেতু বাবু সাহেবও নিজের সাথে ছেলের তুলনা করে বলেছেন –

> "রাজপারভাঙার জমিদারের ছেলে পড়ে নাকি সেই স্কুলে। তাদেরই পড়ারই যুগ্যি... হাঁ, বড় হয়েছ, চেরমেনসাহেব হয়েছ, তোমার ছেলে তো আর তোমার মতো মজকুরি সেপাইয়ের ছেলে নয়।"[১৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 164 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উচ্চবিত্তের কাছে শিক্ষা একটি সহজলভ্য সুযোগ, আর নিম্নবিত্তের কাছে এটি একটি সংগ্রামের বিষয়। অন্ত্যজ মানুষরা শিক্ষার মূল্যকে উপলব্ধি করতে পারে, তারা বোঝে শিক্ষায় একমাত্র উপায়, যার মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন সম্ভব। তাই শিশু ঢোঁড়াইয়ের পিতার আঙুল ধরার উচ্ছ্বাস দেখে তার পিতার স্বপ্ন –

> "একে লেখাপড়া শেখাব চিমনীবাজারের বুড়হা গুরুজীর কাছে। রামায়ণ পড়তে শিখবে, পাড়ার দশ জনকে রামায়ণ পড়ে শোনাবে; ধাঙড়টুলি, মরগামা, কত দূর দূর থেকে লোক আসবে ওর কাছে খাজনার রসিদ পড়াতে।"[১৭]

তাৎমাদের মিসিরজী গোঁসাইথানে রামায়ণ পাঠ করে শোনাত, সকলে তাকে সম্মান করত। প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ ঢোঁড়াইয়ের কপালে জোটেনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত ক্রান্তিদলে রামায়ণ পাঠ করতে শিখে ঢোঁড়াইজি হয়ে ওঠে 'রামায়ণজি'।

ঔপন্যাসিক প্রথম চরণে শিক্ষিত, সভ্য, শহরের মানুষের সাথে অন্ত্যজ তাৎমা-ধাঙড়দের শুধুমাত্র দূরত্ব বা ব্যবধান দেখিয়েছেন। তাৎমাদের সাথে শহরের বাবুসাহেবের সম্পর্ক ঘর ছাওয়ার কাজে, ধাঙড়দের পুরুষ ও নারী উভয়ের সাথে খ্রিস্টানদের সম্পর্ক মালি ও ঘরের কাজে অর্থাৎ কাছাকাছি অবস্থিত সভ্য শিক্ষিত সমাজজীবনের সাথে অন্ত্যজ শ্রেণির সম্পর্ক মূলত স্বার্থ নির্ভর কায়িকশ্রমের। অন্ত্যজ সাধারণ মানুষ রোদ, জল, বৃষ্টিতে কঠোর পরিশ্রম করলেও, সেই শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করে শিক্ষিত উচ্চ সভ্য সমাজ। এ প্রসঙ্গে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর লেখা 'Can the Subaltern speak?' (১৯৮৮) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন –

> "Human labor is not, of course, intrinsically 'cheap' or 'expensive'."[১৮]

অর্থাৎ শ্রম নিজে থেকে সস্তা বা দামি নয় বরং রাষ্ট্র, আইন এবং অর্থনৈতিক কাঠামো তাকে সস্তা করে তোলে। প্রাবন্ধিক বলেছেন শ্রম আইন না থাকা বা বৈষম্যমূলক প্রয়োগ, সর্বাধিপত্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং শ্রমিকের ন্যূনতম জীবিকা - এই সবই শ্রমকে মূল্যহীন করেছে। উচ্চবিত্তের দৃষ্টিতে অন্ত্যজ সমাজের মানুষ ব্যবহারযোগ্য হলেও গ্রহণযোগ্য নয়। এই সমাজব্যবস্থা উত্তর বিহারের তাৎমা, ধাঙড়সহ তৎকালীন সমগ্র ভারতবর্ষের বিশ শতকের প্রথম দশকের শহর সংলগ্ন গ্রামীণ জীবনধারার এক নির্মম বাস্তব চিত্রকে ফুটিয়ে তোলে।

ঔপন্যাসিক দ্বিতীয় চরণে নিস্পৃহ নিরাসক্ত ঢোঁড়াইকে রাজপুতটোলার উচ্চবর্গীয় সভ্য সমাজের বিরুদ্ধে বিসকান্ধার কৃষি নির্ভর অন্ত্যজ সমাজের নায়ক রূপে উন্নীত করেছেন। তাৎমাটুলিতে জমিদার নিয়ে গল্প হলেও জমির গল্প কেউ করত না। তাৎমা মানুষের সাথে শহরের মানুষের সম্পর্ক ছিল কম কিন্তু বিসকান্ধার সমাজ ভিন্ন। বিসকান্ধায় হাসি-কান্না, গল্প, রঙ্গতামাশা সবই চাষবাস আর জমিদারকে নিয়ে। জমির মালিক রাজপুতরা আর কোয়েরীটোলার অন্ত্যজ মানুষগুলো তাদের আধিয়ার। পুরুষেরা কাজ করে তাদের জমিতে; মেয়েরা তাদের ঘরে ঝি-এর কাজ করে। আধিয়ারদের জমির প্রতি টান থাকলেও ফসল ও জমির মালিক তারা নয়। বিল্টা, বুড়হাদাদা প্রভৃতি অন্ত্যজ চাষিদের দুবেলা ঠিকমতো অন্নসংস্থান ঘটে না। দারিদ্রতা আর শোষণ তাদের নিত্যসঙ্গী তাই বিল্টা গানের সুরে বলেছেন –

> "জমিদারের সেপাই এসেছে খাজনা নিতে, রে বিদেশিয়া।
> সকালবেলা ধরে নিয়ে গিয়েছে ভাসুরকে, রে বিদেশিয়া,
> বেঁধে রেখেছে তাকে কুটি খুঁটিতে, রে বিদেশিয়া,
> থালা বাটি নিয়ে যা সেপাই, বাকি খাজনার দাবিতে।
> তা নয়, সেপাই আসে, রাতের বেলায় জ্বালাতে।"[১৯]

গানহীবাওয়া ধারণা এখানে সংস্কারে পরিণত হয় না বরং তার মতাদর্শকে অসৎভাবে ব্যবহার করে আবির্ভূত হয়েছে বচ্চন সিং, অনোখিবাবু, লাডলিবাবুর মতো সুবিধাভোগী চরিত্র। নিজের জাতের পঞ্চদের বিরুদ্ধে ঢোঁড়াই যেরূপ প্রতিবাদ করেছে সেইরূপ বিরোধিতা বিসকান্ধার সাধারণ মানুষ উচ্চবিত্ত সমাজের নির্মিত ক্ষমতার কাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ঢোঁড়াইরা বুঝেছে বাবুসাহেবরা স্বেচ্ছায় অধিকার দেবে না জোর করে ছিনিয়ে আদায় করতে হবে –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 164 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "ঢোঁড়াইরা গোলার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, আমরা গোলা থেকে মেপে ধান বার করে নিচ্ছি। এক ছটাক ধানও এদিক ওদিক হবে না।"[২০]

এখানে প্রথম চরণকে যদি ধরা হয় ঢোঁড়াইয়ের চেতনার বীজ রোপণের পর্ব, তবে দ্বিতীয় চরণ সেই বীজের পূর্ণ বিকাশ ও ফলপ্রাপ্তি। প্রথম চরণের সংগ্রাম, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিই দ্বিতীয় চরণে তার চরিত্রকে পরিণত ও সম্পূর্ণ করে তোলে। একদিকে ঢোঁড়াইয়ের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে গড়ে ওঠে অন্ত্যজ কোয়েরীটোলার দল অন্যদিকে বাবুসাহেব জমিদার, স্বার্থান্বেষী গিরিধর, মুসলমানধর্মী ইনসান আলি, হাকিম, দারোগা-পুলিশ সকলকে নিয়ে গড়ে তোলেন উচ্চবিত্তের দল। শিক্ষা ও অর্থের অভাবে ঢোঁড়াইয়ের দল আইনি অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার বা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার উপায় সম্পর্কে অবগত নয়। ফলে বাবুসাহেবের চাতুর্য ও কৌশলের সামনে তারা সহজেই পরাজিত হয়। উচ্চবিত্ত শ্রেণির শোষণমূলক চরিত্রই এই অংশে নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বাবু সমাজ নিজেদের ক্ষমতা ও সম্পদের জোরে প্রান্তিক মানুষদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তারা প্রয়োজনের সময় অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ সাঁওতালদের জমির লোভ দেখিয়ে ব্যবহার করে, কিন্তু সামাজিক মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে তাদের বর্জন করেছেন। ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পে বিসকান্ধার সমস্ত কুয়ো ইঁদারা বুজে গেলে বাবুসাহেব ও রাজপুতরা অন্ত্যজ শ্রেণির সরলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের কার্যসিদ্ধি উদ্ধার করেন। বাবুসাহেবের ছেলে লাডলীবাবু ভালোমানুষির মুখোশ পড়ে ঢোঁড়াইয়ের দলকে আশ্বাস্ত করে বলেন তারাও ভূমিকম্পের ক্ষতিপূরণ পাবে। বাস্তবে রিলিফ পেল রাজপুতটোলার সভ্য সমাজ। এই দ্বিচারিতা উচ্চবিত্ত সমাজের ভণ্ডামিকে স্পষ্ট করে তোলে। আবার এই অন্ত্যজশ্রেণি দ্বিতীয়বার বিশ্বাস করে ঠকেছে 'বলন্টিয়রজী'-র ভোটকে কেন্দ্র করে সত্যাগ্রহ উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে। ঢোঁড়াই ও তার সমাজ বারংবার বিশ্বাস করে ঠকেছে কিন্তু নিজস্বতাকে দমন করেনি। তারা বিশ্বাস করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। ঢোঁড়াইসহ প্রান্তিক মানুষ উপলব্ধি করেছে দুনিয়াটা বদলাচ্ছে, একমাত্র সজীব 'পাক্কী' টাও অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। তাৎমাটুলির 'গানহীবাওয়া', বিসকান্ধার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর নতুন রাজা সরকার বাহাদুর সবকিছু মিলিয়ে ঢোঁড়াইয়ের অভিজ্ঞতা জট পাকিয়ে যায়। ঢোঁড়াই জানে 'রামায়ণ'-এ রাজা একটাই কিন্তু সমাজে রাজার রূপটা ধরা যায় না –

> "সেই রাজা এসে গিয়েছেন কাছে। আবছা রূপটা স্পষ্ট দেখা না গেলেও অনুভব করা যায়। 'পাক্কী' আর পাটের দামের রাজা, কাপড় আর কেরোসিনের রাজা, মাটিতে জমিদার, হাকিম, দারোগা, ফৌজের রাজা, আকাশে হাওয়াই জাহাজের রাজা, বাতাসে ফৌজি হাওয়াগাড়ির গন্ধর রাজা।"[২১]

'রামায়ণ' এসব রাজার উল্লেখ নেই এইসব আছে 'নিলামি ইস্তাহার ওয়ালা' মাস্টারসাহেবের খাতায়। অন্যদিকে, লাডলীবাবু কন্ট্রোলের মাল দিয়েছে অনোখীবাবু, ইনসান আলি আর গিরিধরকে। মধু থেকে আরম্ভ করে রাঙা আলু সবকিছুই চলে যাচ্ছে আসামে। রাজ্যের সমস্ত লোক ঠিকেদার হয়ে উঠেছে, সভ্য সমাজের মনোভাব এই সময় নিজের আখের গুছিয়ে নেবার। ফলে ভারতবর্ষের সমগ্র খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষ আরও প্রান্তিক হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪২ অগাস্ট আন্দোলনে উত্তেজিত হয়ে ঢোঁড়াইয়ের দল তিতলি কুঠি দহন করে। পরবর্তীতে ঢোঁড়াইয়ের পলায়ন তারপর 'আজাদ দস্তা' দলে প্রবেশ, অক্ষরজ্ঞান লাভ করে 'রামায়ণ' পাঠ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রামায়ণের আদর্শও ঢোঁড়াইকে স্থির রাখতে পারেনি, কারণ এখানেও দলাদলি, স্বার্থান্বেষী মনোভাবের তীব্র প্রতিযোগিতা। শেষবারের মতো ঢোঁড়াই রামিয়ার গর্ভজাত ভেবে এন্টনিকে কেন্দ্র করে জীবনের পথে হাঁটতে চেয়েছিল কিন্তু বার বার হোঁচট খেতে খেতে পুনরায় ফিরে আসে জমাট অন্ধকার ও গভীর শূণ্যতায়। লেখকও রাজনীতির স্বার্থনীতিতে বিশ্বাসঘাতকতার আগুনে বার বার পুড়েছে। শেষপর্যন্ত ঢোঁড়াইয়ের মতো লেখকও ঘুরে এসেছেন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায়। একইভাবে তাৎমা, ধাঙড়, কোয়েরী প্রভৃতি অন্ত্যজ সমাজের সাধারণ মানুষও থেমে থাকেনি এক জায়গায়; তাদেরও চিন্তা ও জীবনধারার পরিবর্তন ঘটেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ী 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটিতে অন্ত্যজ মানুষের জীবনসংগ্রামকে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিতে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'রামচরিত মানস'-এর আদর্শে নির্মিত হলেও এটি কোনো পৌরাণিক অনুকরণ নয়; বরং সাধারণ মানুষের জীবনকে 'রাম'-সুলভ মর্যাদায় উন্নীত করার এক সচেতন শিল্পপ্রয়াস। রাম যেমন আদর্শ নায়ক— ধর্ম, ন্যায় ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 164 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সত্যের প্রতীক; তেমনি ঢোঁড়াইও এক বিশেষ অর্থে নায়ক। সে অন্ত্যজ সমাজের প্রতিনিধি হয়ে সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। উভয়েই নিজ নিজ প্রেক্ষাপটে নেতৃত্বের প্রতীক। রামের বনবাস অন্যদিকে বাবার মৃত্যুর পর মায়ের পরিত্যাক্ত ঢোঁড়াই বৌকাবাওয়ার কাছে অবস্থান। রাবণের বিরুদ্ধে রামের যুদ্ধ - সবই ধর্মরক্ষার সংগ্রাম। ঢোঁড়াইও উচ্চবর্গীয় সমাজের শোষণ, বঞ্চনা ও অবহেলার বিরুদ্ধে লড়াই করে। রাম তাঁর প্রজাদের কল্যাণের জন্য আদর্শ রাজা। ঢোঁড়াই অন্ত্যজ মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য তাদের নায়ক রূপে বিবেচিত। এখানে ঢোঁড়াই কেবল ব্যক্তি নয়, সমগ্র প্রান্তিক সমাজের প্রতিনিধি তার জীবনসংগ্রাম ভারতবর্ষের নিপীড়িত প্রান্তিক মানুষের ইতিহাসকে ধারণ করে। সেইজন্যই গোপাল হালদার বলেছেন -

"এ কালের ঢোঁড়াই সেকালের রামের আধুনিক বিকল্প।"[২২]

রাম বিষ্ণুর অবতার আদর্শের প্রতীক অন্যদিকে ঢোঁড়াই সম্পূর্ণ মানবিক, ত্রুটিপূর্ণ, দ্বিধাগ্রস্ত কিন্তু বাস্তব। আখ্যানের বিস্তৃত কাহিনি, বহুচরিত্রের সংঘাত, এবং সময়ের গভীর প্রবাহ উপন্যাসটিকে মহাকাব্যের বিশালতার সঙ্গে যুক্ত করেছে। ১৯১৭ থেকে ১৯৪৫-এর রাজনৈতিক অস্থির সময়ে সাধারণ মানুষের অধিকারচেতনা, শোষণবিরোধী সংগ্রাম এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এই কাহিনিতে প্রাণ পেয়েছে। ঢোঁড়াইয়ের চরিত্রে বীরত্ব, ত্যাগ ও মানবিকতার সমন্বয় তাকে এক আধুনিক মহাকাব্যিক নায়কে পরিণত করে। ভাষার দিক থেকেও উপন্যাসটি লৌকিকতা ও মহাকাব্যিক উচ্চতার এক অনন্য মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছে। আঞ্চলিক জীবনের মাটির গন্ধ যেমন আছে, তেমনি আছে সর্বভারতীয় বিস্তারের অনুভব। বীর, করুণ ও ঐতিহাসিক রসের সংমিশ্রণে রচিত এই কাহিনি পাঠকের মনে বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও গভীর মানবিক বোধ জাগিয়ে তোলে।

সমগ্র আলোচনার নির্যাসে প্রতীয়মান হয় যে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' কেবলমাত্র একটি উপন্যাস নয়, বরং প্রান্তিক মানুষের জীবনযন্ত্রণার এক মহাকাব্যিক রূপায়ণ, যেখানে অন্ত্যজ সমাজের সাধারণ মানুষই হয়ে ওঠে ইতিহাসের নায়ক। অন্ত্যজ সমাজের ভৌগোলিক অবস্থান, শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে সৃষ্ট কুসংস্কার, ধর্ম, সমাজের রীতিনীতি, দারিদ্র্য, শোষণ, শিক্ষার আকাঙ্খা ও সামাজিক বঞ্চনার যে নির্মম বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা বিশ শতকের তৃতীয়, চতুর্থ দশকের সমগ্র ভারতবর্ষের অন্ত্যজ সমাজের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ঢোঁড়াইয়ের জীবনসংগ্রাম, প্রতিবাদ, ভ্রান্তি ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে আত্মচেতনা, যা নিপীড়িত মানুষের অস্তিত্ববোধকে নতুন মাত্রা দেয়। একই সঙ্গে লেখক দেখিয়েছেন, শোষণের কাঠামো শুধু উচ্চবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; প্রান্তিক সমাজের ভেতরেও বিভাজন ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সক্রিয়, যা তাদের উন্নতির পথকে আরও জটিল করে তোলে।

রাজনৈতিক আদর্শ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও লোকজ সংস্কারের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এই উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিফলনও এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তবে সেই আদর্শ প্রান্তিক সমাজে পৌঁছালেও তা প্রায়শই বিকৃত ও সরলীকৃত রূপে আত্মপ্রকাশ করে, যা তাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে একধরনের বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। তবুও, এই সমাজ স্থবির নয়; অভিজ্ঞতার অভিঘাতে তারা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়, প্রশ্ন তোলে এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। অতএব, বলা যায়— 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটি প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রামকে মহাকাব্যের মর্যাদায় উন্নীত করে এবং প্রতিষ্ঠা করে এই সত্য যে, ইতিহাসের প্রকৃত নায়ক সেই সাধারণ মানুষ, যারা অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নিজেদের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করে চলে।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী, (ষষ্ঠ খণ্ড) বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ. ৭২
২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুবল, সম্পাদক, সতীনাথ স্মরণে, ভারতী ভবন, পাটনা, ১৯৭২, পৃ. ৮২
৩. ঘোষ, শঙ্খ, নির্মাল্য আচার্য, সম্পাদক, সতীনাথ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২৪, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. ৪৬৪
৪. ঘোষ, শঙ্খ, নির্মাল্য আচার্য, সম্পাদক, সতীনাথ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২৪, পৃ. ০৩
৫. তদেব, পৃ. ১৪

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 164 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৬. তদেব, পৃ. ১৪
৭. তদেব, পৃ. ৮০
৮. তদেব, পৃ. ২২
৯. তদেব, পৃ. ৭৪
১০. তদেব, পৃ. ৫১
১১. তদেব, পৃ. ৪৭
১২. তদেব, পৃ. ১৮
১৩. তদেব, পৃ. ৩১
১৪. তদেব, পৃ. ৩৩
১৫. তদেব, পৃ. ১২৪
১৬. তদেব, পৃ. ২২৭
১৭. তদেব, পৃ. ১২
১৮. Spivak, Gayatri Chakraborty, Can the Subaltern Speak?, পৃ. ৮৩
১৯. ঘোষ, শঙ্খ, নির্মাল্য আচার্য, সম্পাদক, সতীনাথ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২৪, পৃ. ১৪৯
২০. তদেব, পৃ. ১৬৮
২১. তদেব, পৃ. ২৩৮
২২. হালদার, গোপাল, সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা, অয়ন, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৫৫

Bibliography:

মন্ডল, স্বস্তি, সত্যসন্ধানী সতীনাথ ভাদুড়ী জাগরী ও ঢোঁড়াই চরিতমানস দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১
বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, ১৪১০
হালদার, গোপাল, সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা, অয়ন, কলিকাতা, ১৯৭৮
মুখোপাধ্যায়, তরুণ, সম্পাদক, সতীনাথ ভাদুড়ী : অন্বেষণে, অনুভবে, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ – ২০০২
ভট্টাচার্য, অরূপকুমার, সতীনাথ ভাদুড়ী জীবন ও সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৩৬৬
ভদ্র, গৌতম, চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, সম্পাদক, নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২২
ঘোষ, শঙ্খ, নির্মাল্য আচার্য, সম্পাদক, সতীনাথ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২৪
ঘোষ, শঙ্খ, নির্মাল্য আচার্য, সম্পাদক, সতীনাথ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২৪

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

Spivak, Gayatri Chakraborty, Can the Subaltern Speak? (বৈদ্যুতিন মাধ্যম – https://voidenetwork.gr)